পাদটীকা

সৈয়দ মুজতবা আলী

গত শতকের শেষ আর এই শতকের গোড়ার দিকে আমাদের দেশের টোলগুলো মড়ক লেগে প্রায় সম্পূর্ণ উজাড় হয়ে যায় । পাঠক-মোগল আমলে যে দুর্দৈব ঘটেনি ইংরাজ রাজত্বে সেটা প্রায় আমাদেরই চোখের সামনে ঘটল । অর্থনৈতিক চাপে পড়ে দেশের কর্তাব্যক্তিরা ছেলেভাইপোকে টোলে না পঠিয়ে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাতে আরম্ভ করলেন ।চতুর্দিকে ইংরেজি শিক্ষার জয়-জয়কার পড়ে গেল-সেই ডামাডোলে বিস্তর টোল মরল, আর বিস্তর কাব্যতীর্থ বেদান্তবাগীশ না খেয়ে মারা গেলেন ।

এবং তার চেয়েও হৃদয়বিদারক হল তাঁদের অবস্থান, যাঁরা কোনগতিকে সংস্কৃতির বা বাঙলার শিক্ষক হয়ে হাই-স্কুলগুলোতে স্থান পেলেন । এঁদের আপন বিষয়ে অর্থাৎ কাব্য, অলঙ্কার, দর্শন ইত্যাদিতে এঁদের পান্ডিত্য ছিল অন্যান্য শিক্ষকদের তুলনায় অনেক বেশী কিন্তু সম্নান এবং পারিশ্রমিক এঁরা পেতেন সবচেয়ে কম ।শুনেছি কোনো কোনো ইস্কুলে পন্ডিতের মাইনে চাপরাসীর চেয়ে কম ছিল ।

আমাদের পন্ডিতমশাই তর্কালঙ্কার না কাব্যবিশারদ ছিলেন আমার আর ঠিক মনে নেই কিন্তু একথা মনে আছে যে পন্ডিতসমাজে তাঁর খ্যাতি ছিল প্রচুর এবং তাঁর পিতৃপিতামহ চতুর্দশ পুরুষ শুধু যে ভারতীয় সংস্কৃতির একনিষ্ট সাধক ছিলেন তা নয়, তাঁরা কখনো পরান্ন ভক্ষণ করেননি-পালপরব শ্রান্ধনিমন্ত্রণে পাত পড়ার তো কথাই ওঠে না ।

বাঙলা ভাষার প্রতি পন্ডিতমশাইয়ের ছিল অবিচল,অকৃত্রিম অশ্রদ্ধা-ঘৃনা বললেও হয়ত বাড়িয়ে বলা হয় না । বাঙলাতে যেটুকু খাঁটি সংস্কৃত আছে তিনি মাত্র সেইটুকু পড়াতে রাজী হতেন-অর্থাৎ কৃৎ, তদ্ধিত,সন্ধি এবং সমাস। তাও বাঙলা সমাস না । আমি একদিন বাঙলা রচনার 'দোলা-লাগা' 'পাখী জাগা' উদ্বৃত করেছিলুম বলে । তিনি আমার দিকে দোয়াত ছুঁড়ে মেরেছিলেন । ক্রিকেট ভাল খেলা-সেদিন কাজে লেগেছিল । এবং তার পরমুহূর্তেই বি পূর্বক,আ পূর্বক, আশীর্বাদ করে বলেছিলেন, এই দন্ডেই তুই স্কুল ছেড়ে চতুস্পাঠীতে যা । সেখানে তোর সত্য বিদ্যা হবে'।

কিন্তু পন্ডিতমশাই যত না পড়াতেন, তার চেয়ে বকতেন ঢের বেশী, এবং টেবিলের উপর পা দু'খানা তুলে ঘুমুতেন সব চেয়ে বেশী। বেশ নাক ডাকিয়ে, এবং হেডমস্টারকে একদম পরোয়া না করে । কারণ হেডমস্টার তাঁর কাঁছে ছেলেবেলায় সংস্কৃত পরেছিলেন এবং তিনি যে লেখাপড়ার সর্বাঙ্গনিন্দনীয় হস্থীমূর্খ ছিলেন কাহিনী শুনে বিমালনন্দ উপভোগ করতুম আর পন্ডিতমশাইকে খুশী করবার পন্থা বাড়ন্ত হলে ঐ বিষটি নতুন করে উপাস্থাপনা করতুম ।

আমাকে পন্ডিতমশাই একটু বেশী স্নেহ করতেন । তার কারণ বিদ্যাসগরী বাঙলা লেখা ছিল আমার বাই; ঐ 'দোলা লাগা,পাখী-জাগা'ই আমার বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনে একমাত্র গোমাংস ভক্ষণ । পন্ডিতমশাই যে আমাকে সবচেয়ে বেশী স্নেহ করতেন তার প্রমান তিনি দিতেন আমার উপর অহরহ নানা প্রকার কটুকাটব্য বর্ষণ করে । 'অনার্য', 'শাখা-মৃগ', 'দ্রাবির-সম্ভৃত' কথাগুলো ব্যবহার না করে তিনি আমাকে সাধারণতঃ সম্বোধন করতেন না; তা ছাড়া এমন সব অশ্লীন কথা বলতেন যে তার সঙ্গে তুলনা দেবার মত জিনিস আমি দেশবিদেশে কোথাও শুনিনি । তবে একথাও স্বীকার করতে হবে যে পন্ডিতমশাই শ্লীল অশ্লীল উভয় বস্তুই একই সুরে একই পরিমাণে ঝেড়ে যেতেন, সম্পূর্ণ অচেতন, বীতরাগ এবং লাভালাভের আশা বা ভয় না করে এবং তাঁর অশ্লীলতা মার্জিত না হলেও অত্যন্ত বিদগ্ধরুপেই দেখা দিত বলে আমি বহু অভিজ্ঞতার পর এখনো মনস্থির করতে পারিনি যে সেখানে শুনতে পেয়ে আমার লাভ না ক্ষতি, কোনটা বেশী হয়েছে ।

পন্ডিতমশায়ের বর্ণ ছিল শ্যাম, তিনি মাসে একদিন দাড়ি গোঁফ কামাতেন এবং পরতেন হাঁটু- জোকা ধুতি। দেহের উত্তমার্ধে একখানা দড়ি প্যাচানো থাকত- অজ্ঞেরা বলত সেটা নাকি দড়ি নয়, চাদর। ক্লাসে ঢুকেই তিনি সেই দড়িখানা টেবিলের উপর রাখতেন, আমাদের দিকে রোষকষায়িত লোচনে তাকাতেন, আমদের বিদ্যালয়ে না এসে যে চাষ করতে যাওয়াটা সমধিক সমীচীন সে কথাটা দ্বিসহস্র বারের মত স্মরন করিয়ে দিতে দিতে পা দু'খানা টেবিলের উপর লম্বমান করতেন। তারপর যে-কোন একটা অজুহাত ধরে আমাদের এক চোট বকে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়তেন। নিত্যন্ত যে-দিন কোন অজুহাতই পেতেন না –ধর্মসাক্ষী সে-কসুর আমাদের নয় –সেদিন দু'চারটে কৃৎ-তদ্ধিত সম্বন্ধে আপন মনে-কিন্তু বেশ জোরগলায়-আলোচনা করে উপসংহারে বলতেন, 'কিন্তু এই মূর্খদের বিদ্যাদান করার প্রচেষ্টা বন্ধ্যাগমনের মত নিষ্ফল নয় কি ? তারপর কখনো আপন গতাসু চতুষ্পাঠীর কথা স্মরণ করে বিড়বিড় করে বিশ্বব্রহ্মান্ডকে অভিশাপ দিতেন, কখনো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে টানা-পাখার দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে ঘুমিয়ে পড়তেন।

শুনেছি ঋগ্বেদে আছে, যম পত্নী যমী যখন মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকাতুরা হয়ে পড়েন তখন দেবতারা তাঁকে কোনো প্রকারে সান্তনা না দিতে পেরে শেষটায় তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাই আমার বিশ্বাস, পন্ডিতমশায়ের টোল কেড়ে নিয়ে দেবতারা তাঁকে সান্তনা দেবার জন্য ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। কারণ এরকম দিনযামিনী সায়ংপ্রাতঃ শিশিরবসন্তে বেঞ্চি-চৌকিতে যত্রতত্র অকাতরে ঘুমিয়ে পড়তে পারাটা দেবতার দান-একথা অস্বীকার করার জো নেই।

বহু বৎসর হয়ে গিয়েছে, সেই ইস্কুলের সামনে সুরমা নদী দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে কিন্তু আজো যখন তাঁর কথা ব্যাকারণ সম্পর্কে মনে পড়ে তখন তাঁর যে ছবিতে দেখি, টেবিলের উপর দু'পা তোলে, মাথা একদিকে ঝুলে-পড়া, টিকিতে দোলা-লাগা কাষ্ঠাসন শরশয্যায় শায়িত ভরতীয় ঐতিহ্যের শেষ কুমার ভীষ্মদের। কিন্তু ছিঃ, আবার 'দোলা-লাগা' সমাস ব্যবহার করে পন্ডিতমশায়ের প্রেতাত্মাকে ব্যথিত করি কেন ?

সে-সময়ে আসামের চীফ-কমিশনার ছিলেন এন.ডি.বীটসন বেল। সায়েবটির মথায় একটি ছিট ছিল। প্রথম পরিচয়ে তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতেন যে তাঁর নাম, আসলে 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'। 'এন.ডি'তে হয় 'নন্দদুলাল' আর বীটসন বেল অর্থ 'বাজায় ঘন্টা'-দুয়ে মিলে হয় 'নন্দদুলাল বাজায় ঘন্টা'।

সেই নন্দদুলাল এসে উপস্থিত হলেন আমদের শহরে।

ক্লাসের জ্যাঠা ছেলে ছিল পদ্ম লোচন। সে-ই একদিন খবর দিল লাট সাহেব আসছেন স্কুল পরিদর্শন করতে-পদ্মর ভগ্নীপতি লাটের টুর ক্লার্ক না কি,সে তার কাছ থেকে পাকা খবর পেয়েছে।

লাটের ইস্কুল আগমন অবিমিশ্র আন্দদায়ক অভিজ্ঞতা নয়। এতদিক দিয়ে যেমন বলা নেই, কওয়া নেই হঠাৎ কসুর বিন-কসুরে লাট আসার উত্তেজনায় খিটখিটে মাস্টারদের কাছ থেকে কপালে কিলটা চড়টা আছে, অন্যদিকে তেমনি লাট চলে যাওয়ার পর তিন দিনের ছুটি।

হেডমাস্টারমশায়েইর মেজাজ যখন সকলের প্রাণ ভাজা ভাজা করে ছাই বানিয়ে ফেলার উপক্রম করেছে এমন খবর পাওয়া গেল, শুক্কুরবার দিন হুজুর আসছেন।

ইস্কুল শুরু হওযার এক ঘন্টা আগে আমরা সেদিন হাজিরা দিলুম। হেডমাস্টার

ইস্কুলের সর্বত্র চর্কিবাগজীর মত তুর্কীনাচন নাচছেন। যে দিকে তাকাই সেদিকিই হেডমাস্টার- নিশ্চয়ই তাঁর অনেকগুলো যমজ ভাই আছেন, তার ইস্কুল সামলাবার জন্য সেদিন সব ক'জনকে রিকুইজিশন করে দিয়ে এসেছেন।

পদ্মলোচন বলল, 'কমন-রুমে গিয়ে মজাটা দেখে আয়'।

'কেন কি হয়েছে'?

পদ্ম আর যা করে করুক কখনো বাসি খবর বিলোয় না। হেডমাস্টারের চড়ের ভয় না মেনে কমন-রুমের কাছে গিয়ে জানালা দিয়ে দেখি অবাক কান্ড। আমাদের পন্ডিতমশাই একটা লম্বা-হাতা আনকোরা নূতন হলদে রঙের গেঞ্জি পরে বসে আছেন আর বাদবাকি মাস্টাররা কলরব করে সে-গেঞ্জিটার প্রশংসা করছেন। নানা মুনি নানা গুন কীর্তন করেছেন;কেউ বলেছেন পন্ডিতমশাই কি বিচক্ষন লোক, বেজায় সস্তায় দাঁও মেরেছেন (গাঁজা,পন্ডিতমশায়ের সাংসারিক বুদ্ধি একরত্তিও ছিল না), কেউ বলেছেন আহা,যা মানিয়েছেনা (হাতী, পন্ডিতমশাইকে সার্কাসের সঙের মত দেখছিল), কেউ বললেন, যা ফিট করছেনা (মরে যাই, গেঞ্জি আবার ফিট-অফিট কি?)। শেষটায় পন্ডিতমশায়ের ইয়ার মৌলবী সায়েব দাড়ি দুলিয়ে বললেন, 'বুঝলে ভশ্চার্য এরকম উদমা গেঞ্জি দু'খানা তৈরি হয়েছিল, তার-ই একটা কিনেছিল পঞ্চম জর্জ,আর দুসরাটা কিনলে তুমি। এ দুটো বানাতে গিয়ে কোম্পানী দেউলে হয়ে গিয়েছে, আর কারো কপালে এনকম গেঞ্জি নেই'।

চাপরাসী নিত্যানন্দ দূর থেকে ইশারায় জানাল, 'বাবু আসছেন'।.

তিন লম্ফে ক্লাসে ফিরে গেলুম।

সেকেন্ড পিরিয়ডে বাঙলা। পন্ডিতমশাই আসতেই আমরা সবাই ত্রিশ গাল হেসে গেঞ্জিটার দিকে তাকিয়ে রইলুম। ইতিমধ্যে রেবতী খবর দিল যে শাস্ত্রে সেলাই-করা কাপড় পরা বারণ বলে পন্ডিতমশাই পাঞ্জাবী শার্ট পরেন না, কিন্তু লাট সায়েব আসছেন, শুধু গায়ে ইস্কুলে আসা চলবে না তাই গেঞ্জি পরে এসেছেন। গেঞ্জি বোনা জিনিস, সেলাই-করা কাপড়ের পাপ থেকে পন্ডিতমশাই এই কৌশলে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। গেঞ্জি দেখে এতই মুগ্ধ যে পন্ডিতমশায়ের গালাগাল, বোয়াল-চোখ সব কিছুর জন্যই আমার তখন তৈরী কিন্তু কেন জানিনে তিনি তাঁর রুটিন মাফিক কিছু করেন না। বকলেন না, চোখ লাল করলেন না, লাট আসছেন কাজেই টেবিলে ঠ্যাং তোলার কথাও উঠতে পারে না। তিনি চেয়ারের উপর অত্যন্ত বিরস বদনে বসে রইলেন। পদ্মলোচনের ডর ভয় কম। আহ্লাদে ফেটে গিয়ে বলল, 'পন্ডিতমশাই, গেঞ্জিটা কদ্দিয়ে কিনলেন?' আশ্চর্য, পন্ডিতমশাই খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠলেন না, নির্জীব কন্ঠে বললেন, 'পাঁচ সিকে'।

আধ মিনিট যেতে না যেতেই পন্ডিতমশাই দুহাত দিয়ে ক্ষণে হেথায় চুলকান ক্ষণে হোথায় চুলকান। পিঠের অসম্ভব জায়গায় কখনো ডান হাত, কখনো বাঁ হাত দিয়ে চুলকানোর চেষ্টা করেন, কখনো মুখ বিকৃত করে গেঞ্জির ভিতর হাত চালান করে পাগলের মত এখানে ওখানে খ্যাঁক খ্যাঁক করে খামচান।

একে তো জীবনভর উত্তমাঙ্গে কিছু পরেননি, তার উপর গেঞ্জি, সেও আবার একদম নতুন কোরা গেঞ্জি।

বাচ্চা ঘোড়ার পিঠে পয়লা জিন লাগালো সে যে-রকম আকাশের দিকে দু'পা তুলে তড়পায় শেষটায় পন্ডিতমশায়ের সেই অবস্থা হল। কখনো করুণ কন্ঠে অস্ফুট আর্তনাদ করেন, 'রাধামাধব এ কী গব্ব-যন্ত্রণা,' কখনো এক হাত দিয়ে আরেক্ হাত চেপে ধরে,দাঁত কিড়মিড়ি খেয়ে আত্মসম্বরণ করার চেষ্টা করেন-লাট সায়েবের সামনে তো সব্বাঙ্গ আঁচড়ানো যাবে না।

শেষটায় থাকতে না পেরে আমি উঠে বললুম, 'পন্ডিতমশাই, আপনি গেঞ্জিটা খুলে ফেলুন। লাট সায়েব এলে আমি জানালা দিয়ে দেখতে পাব। তখন নাহয় ফের পরে নেবেন'।

বললেন, 'ওদের জড়ভরত,গব্ব-যন্ত্রণাটা খুলছি নে, পরার অভ্যেস হয়ে যাবার জন্য'। আমি হাত জোড় বললু, 'একদিনে অভ্যেস হবে না পন্ডিতমশাই,ওটা আপনি খুলে ফেলুন'।

আসলে পন্ডিতমশাইয়ের মতলব ছিল গেঞ্জিটা খুলে ফেলারই; শুধু আমাদের কারো কাছ থেকে একটু মরাল সাপোর্টের অপেক্ষায় এতক্ষন বসেছিলেন।তবু সন্দহ-ভরা চোখে বললেন, 'তুই তো একটা আস্ত মর্কট-শেষটায় আমাকে ডোবাবি না তো? তুই যদি হুঁশিয়ার না করিস, আর লাট যদি এসে পড়েন?'

আমি ইহলোক পরলোক সর্বলোক তুলে দিব্যি, কিরে, কসম খেলুম।

পন্ডিতমশাই গেঞ্জিটা খুলে টেবিলের উপর রেখে সেটার দিকে যে দৃষ্টি হানলেন, তাঁর টিকিটা কেউ কেটে ফেললেও তিনি তার দিকে এর চেয়ে বেশী ঘৃনা মাখিয়ে তাকাতে পারতেন না। তারপর লুপ্ত-দেহটা ফিরে পাওয়ার আনন্দে প্রাণভরে সর্বাঙ্গ খামচালেন। বুক পিঠ ততক্ষনে লাল লাল আঁজিতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে।

এর পর আর কোন বিপদ ঘটল না। পন্ডিতমশাই থেকে থেকে রাধামাধবকে স্মরন করলেন, আমি জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলুম, আর সবাই গেঞ্জিটার নাম ধাম, কোন দোকানে কেনা, সস্তা না আক্রা, তাই নিয়ে আলোচনা করল।

আমি সময়মত ওয়ার্নিং দিলুম। পন্ডিতমশাই আবার তাঁর 'গব্ধ-যন্তণাটা' উত্তমাঙ্গে মেখে নিলেন। লাট এলেন, সঙ্গে ডেপুটি কমিশনার, ডাইরেকটর, ইনসপেকটর, হেডমাষ্টার নিত্যানন্দ-আর লাট সায়েবের এডিসি ফেডিসি না কি সব বারান্দায় জটলা পাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। 'হ্যালো পানডিট' বলে সায়েব হাত বাড়ালেন। রাজসম্মান পেয়ে পন্ডিতমশায়েব সব যন্ত্রনা লাঘব হল। বার বার ঝুঁকে ঝুঁকে সায়েবকে সেলাম করলেন- এই অনাদৃত পন্ডিতশ্রেণী সামান্যতম গতানুগতিক সম্মান পেয়েও যে কিরকম বিগলিত হতেন তা তাঁদের সে-সময়কার চেহারা না দেখলে অনুমান করার উপায় নেই।

হেডমাষ্টার পন্ডিতমশায়েব কৃত-তদ্বিতের বাই জানতেন; তাই নির্ভয়ে ব্যাকরণের সর্বোচ্চ নভঃস্থলে উড্ডীয়মান হয়ে 'বিহঙ্গ' শব্দের তত্বানুসন্ধান করলেন। আমরা জন-দশেক একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললুম, 'বিহায়স পূর্বক গম ধাতু খ'। লাট সায়েব হেসে বললেন, 'ওয়ান এ্যাট এ টাইম, প্লীজ'। লাট সায়েব আমাদের বলল 'প্লীজ' এ কী কান্ড। তখন আবার আর কেউ রা কাড়ে না। হেডমাষ্টার শুধানের 'বিহঙ্গ' আমরা চুপ-কখনো 'প্লীজের' তখনো ধকল কাটেনি। শেষটায় ব্যাকরণে নিরেট পাঁঠা যতেটা আমাদের উত্তর আগে শুনে নিয়েছিল বলে ক্লাসে নয় দেশে নাম করে ফেললে-আমার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম।

লাট সায়েব ততক্ষণে হেডমাষ্টারের সঙ্গে 'পন্ডিত' শব্দের মূল নিয়ে ইংরেজীতে আলোচনা জুড়ে দিয়েছেন। হেডমাষ্টার কি বলেছিলেন জানিনে তবে রবীন্দ্রনাথ নাকি পন্ডিতদের ধর্মে জড়শীলতায় প্রতি বিদ্রুপ করে বলেছিলেন, যার সব কিছু পন্ড হয়ে গিয়েছে সেই পন্ডিত।

ইংরেজ শাসনের ফলে আমাদের পন্ডিতেদের সর্বনাশ, সর্বস্ব পন্ডের ইতিহাস হয়ত রবীন্দ্রনাথর জানতেন না, -না হলে ব্যঙ্গ করার পূর্বে হয়ত একটু ভেবে দেখতেন।

সে কথা থাক। লাট সায়েব চলে গিয়েছে, যাবার পূর্বে পন্ডিতমশায়েবের দিকে একখানা মোলায়েম নড করাতে তিনি গর্বে চৌচির হয়ে ফেটে যাবার উপক্রম। আনন্দের আতিশায্যে নূতন গেঞ্জির চুলকুনির কথা পর্যন্ত ভুলে গিয়েছিলেন। আমরা দু'তিনবা স্মরন করিয়ে দেবার পর গেঞ্জিটা তাঁর শ্রীঅঙ্গ থেকে ডিগ্রেডেড হল।

তিন দিন ছুটির পর ফের বাঙল ক্লাস বসেছে। পন্ডিতমশাই টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে ঘুমাচ্ছেন, না শুধু চোখবন্ধ করে আছেন ঠিক ঠাহর হয়নি বলে তখনো গোলমাল আরম্ভ হয়নি।

কারো দিকে না তাকিয়েই পন্ডিতমশাই হঠাৎ ভরা-মেগের ডাক ছেড়ে বললেন, 'ওরে ও শাখামৃগ!'

নীল যাঁহার কন্ঠ তিনি নীলকন্ঠ-যোগারুঢ়ার্থে শিব। শাখার যে মৃগ বিচরণ করে সে শাখামৃগ,অর্থাৎ বাঁদর-ক্লাস রুঢ়ার্থে আমি উত্তর দিলুম, 'আজ্ঞে'।

পন্ডিতমশাই শুধালেন, 'লাট সায়েবের সঙ্গ কে কে এসেছিলেন বল তো রে'।

আমি সম্পূর্ন ফিরিস্তি দিলুম। চাপরাসী নিত্যনন্দকেও বাদ দিলুম না। বললেন, 'হল না। আর কে ছিল ?

বললুম, 'ঐ যে বললুম, একগাদা, এডিসি না প্রাইভেট সেক্রেটারি না আর কিছু সঙ্গে ছিলেন। তাঁর তো ক্লাসে ঢোকেননি'।

পন্ডিতমশাই ভরা-মেঘের গুরু গুরু ডাক আরো গম্ভীর করে শুধালেন, 'এক কথা বাহান্ন বার বলছিস কেন রে মূঢ়? আমি কালা না তোর মত অলম্বুষ?'

আমি কাতর হয়ে বললুম, 'আর তো কেউ ছিল না পন্ডিতমশাই ; জিজ্ঞেস করুন না পদ্মলোচনকে,সে তো সবাইকে চেনে।'

পন্ডিতমশাই হঠাৎ চোখ মেলে আমার দিকে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললেন, ‘ওঃ, উনি আবার লেখক হবেন। চোখে দেখতে পাসনে, কানা, দিবান্ধ-রাত্র্যন্ধ হলেও না হয় বুঝতুম। কেন ? লাট সায়েবের কুকুরটাকে দেখতে পাসনি? এই পর্যবেক্ষনশক্তি নিয়ে-’

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, হাঁ হাঁ, দেখেছি। ও তো এক সেকেন্ডের তরে ক্লাসে ঢুকছিল’।

পন্ডিতমশাই বললেন, ‘মর্কট এবং সারমেয় কদাচ একগৃহে অবস্থান করেন না। সে কথা যাক। কুকুরটার কি বৈশিষ্ট ছিল বল তো’।

ভগ্যিস মনে পড়ল। বললুম, ‘আজ্ঞে, একটা ঠ্যাং কম ছিল বলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছিল’।

‘হু’ বলে পন্ডিতমশাই আবার চোখ বন্ধ করলেন।

অনেকক্ষন পর বললেন, ‘শোন। শুক্রবার দিন ছুটির পর কাজ ছিল বলে অনেক দেরিতে ঘাটে গিয়ে দেখি আমার নৌকোর মাঝি এক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ করছেন। লোকটা মুসলমান, মাথায় কিস্তিটুপী। আমকে অনেক সেলাম, টেলাম করে পরিচয় দিল, সে আমাদের গ্রামের মিশ্বর উল্লার মালা; লাট সায়েবের আরদানি, সায়েবের সঙ্গে এখানে এসেছে, আজকের দিনটা ছুটি নিয়েছে তার দিদিকে দেখতে যাবে বলে। ঘাটে আর নৌকা নেই। আমি যদি মেহেরবানী করে একটু স্থান দিই’।

পন্ডিতমশায়েব বাড়ি নদীর ওপারে, বেশ খানিকটে উজিয়ে। তাই তিনি বর্ষাকালে নৌকোয় যাতায়াত করতেন আর সকলকে অকাতরে লিফট দিতেন।

পন্ডিতমশায় বললেন, ‘লোকটার সঙ্গে কথাবর্তা হল। লাট সায়েবের সব খবর জানে, তোর মত কানা নয়, সব জিনিস দেখে, সব কথা মনে রাখে। লাট সায়েবের কুকুরটার একটা ঠ্যাং কি করে ট্রেনের চাকায় কাটা যায় সে-খবরটাও বেশ গুছিয়ে বলল’।

তারপর পন্ডিতমশাই ফের অনেকক্ষন চুপ করে থাকার পর আপন মনে আস্তে আস্তে বললেন, ‘আমি, ব্রাক্ষণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমার আটজনা’।

তারপর হঠাৎ ঘুরিয়ে ফেলে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘মদনমোহন কিরকম আঁক শেখায় রে?’

মদনমোহনবাবু আমাদের অঙ্কের মাষ্টার-পন্ডিতমশায়ের ছাত্র। বললুম ‘ভালই পড়ান’।

পন্ডিতমশাই বললেন ‘বেশ বেশ। তবে শোন। মিশ্বর উল্লার শালা বলল, লাট সায়েবের কুত্তাটার পিছনে মাসে পাঁচাত্তর টাকা খরচ হয়। এইবার দেখি, তুই কিরকম আঁক শিখেছিস। বল তো দেখি, একটা কুকুরে পিছনে পাঁচাত্তর টাকা খরচ হয়, আর সে কুকুরের তিনটে ঠ্যাং হয় তবে ফি ঠ্যাঙের জন্য কত খরচ হয়?

আমি ভয় করেছিলুম পন্ডিতমশাই একটা মারাত্মক রকমের আঁক কষতে দেবেন। আরাম রোধ করে তাড়াতাড়ি বললুম, ‘আজ্ঞে,পঁচিশ টাকা’। পন্ডিতমশাই বললেন,‘সাধু,সাধু’!

তারপর বললেন, ‘উত্তম প্রস্তাব। অপিচ আমি, ব্রাক্ষাণী, বৃদ্ধা মাতা, তিন কন্যা, বিধবা পিসি, দাসী একুনে আমার আটজনা, আমাদের সকলের জীবন ধারণের জন্য আমি মাসে পাই পঁচিশ টাকা। এখন বল তো দেখি, তবে বুঝি তোর পেটে কত বিদ্যে, এই ব্রাক্ষণ-পরিবার লাট সায়েবের কুকুরের ক’টা ঠ্যাঙের সমান?

আমি হতবাক।

‘বল না’।

আমি মাথা নিচু করে বসে রইলুম। শুধু আমি না, সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ।

পন্ডিতমশাই হুঙ্কার দিয়ে করে বসে রইলুম।, ‘উত্তর দে’।

মূর্খের মত একবার পন্ডিতমশায়ের মুখের দিকে মিটমিটিয়ে তাকিয়েছিলুম। দেখি সে মুখ লজ্জা, তিরক্ত, ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গিয়েছে।

ক্লাসের সব ছেলে বুঝতে পেরেছে-কেউ বাদ যায়নি-পন্ডিতমশাই আত্মঅবমাননার কি নির্মম পরিহাস সর্বাঙ্গে মাখছেন, আমদের সাক্ষী রেখে।

পন্ডিতমশাই যেন উত্তরের প্রতীক্ষায় বসেই আছেন। সেই জগদ্দল নিস্তব্কতা ভেঙে কতক্ষণ পরে ক্লাস শেষের ঘন্টা বেজেছিল আমার হিসাব নেই।

এই নিস্তব্কতা নিপীড়নস্মৃতি আমার মন থেকে কখনো মুছে যাব না।

‘নিস্তব্কতা হিরন্ময়’ ‘Silence is golden’ যে মূর্খ বলেছে তাকে যেন মরার পূর্বে একবার একলা-একলি পাই।